তারিখ ... 05 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

# প্রশ্ন ফাঁস রুখতেই হবে

শিক্ষা

অধ্যাপক ড. এম এ মাননান
উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিক্ষার মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন ঢংয়ের কোচিং বাণিজ্য আর প্রশ্ন ফাঁসের কালচার জিইয়ে রেখে মান উন্নয়নের কথা বলা বা চিন্তা করা হিপোক্র্যাসির শামিল। পলিসি প্রণেতা আর শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ধরে আছেন যারা তাদের সবাইকে বিনয়ের সঙ্গে বলি, চোখ বন্ধ করে চলার সুযোগ নেই। বন্ধ চোখে হাঁটলে হোঁচট খেতেই হবে। তখন শুধু আপনাদের পা-ই ভাঙবে না, দেশের পা-ও ভেঙে যাবে আপনাদের কারণে। অবশ হয়ে যাবে জাতির মেরুদণ্ড

সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই দেখি, কোনো না কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে– প্রাথমিক সমাপনী অথবা মাধ্যমিক পরীক্ষা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়। এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আরেক ফাঁস রোগ– নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস। একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ। ফাঁস করা প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে 'ভালো' ফল 'অর্জন' করবে। এ ভালো ফলে 'বিচি' থাকবে না বিধায় এটিতে কখনও অক্কারোদ্গম হবে না। তাই নিরুপায় হয়ে ভালো ফলধারী আমার ছেলে বা মেয়েটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে নগদ অর্থের সঙ্গে অরিজিনাল সনদপত্র, মার্কশিট ইত্যাদি জমা দিয়ে স্পেশাল ডিভাইস পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াবে। এ সুযোগে শহরটাও দেখা হয়ে যাবে, ডিভাইসও মিলে যাবে, যা দিয়ে সহজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরগুলো মৃদুমন্দ তরঙ্গের সঙ্গে ইথারে ভেসে তরতর করে তার কানে পৌঁছে যাবে। আহা, কী আনন্দ! গবেট হওয়া সত্ত্বেও আমার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাবে। মহাসুখে ক্লাস করতে থাকবে। যখন সেমিস্টার ফাইনালের সময় আসবে, তখন আমার প্রিয় সন্তান বিমূঢ় হয়ে দেখবে, সঠিক বিদ্যার অভাবে ক্লাসে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। তখন বাধ্য হয়ে সে ছুটবে প্রশ্নের সন্ধানে। যেভাবে চলছে সেভাবে চললে প্রশ্ন পেয়েও যাবে। সুতরাং ডিগ্রি তার আটকায়– কার সাধ্য? ডিগ্রি নিয়ে সে যাবে নিয়োগ পরীক্ষা দিতে। সেখানেও তো কোনো সমস্যা থাকবে না। পেয়ে যাবে কোনো সিবিএ নেতা থেকে একটি নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন। লাগবে শুধু কিছু টাকা। অবশ্য অর্থ না-ও লাগতে পারে, যদি প্রশ্ন ফাঁস করা হয় শুধুই কোনো চক্রান্ত বা স্যাবোটাজের অংশ হিসেবে।

কিছুদিন আগে দেখেছি ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ফেসবুকের প্রশ্নহাটে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হচ্ছে। এক শ্রেণির দুর্বৃত্ত, তারা নাকি আবার শিক্ষক, কৌশলে প্রশ্ন হাতিয়ে নিয়ে বিক্রির জন্য ফেসবুকে অফার দিচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে তারা আর টাকা-পয়সা কিছুই নিচ্ছে না। এমনি এমনি প্রশ্ন সবার হাতে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় শুরু করেছে। এতদিন ছিল তাদের মূল্যের বিনিময়ে বেপরোয়া প্রশ্ন-বাণিজ্য, এখন চলছে মূল্যছাড়া পুণ্য-বাণিজ্য। এতেই বোঝা যায়, ডালমে কুচ্ কালা হ্যায়। প্রশ্ন ফাঁস শুধু প্রশ্ন ফাঁসের জন্য নাও হতে পারে। মতলব অন্য কোথাও। সে মতলবটা কী? জানা নেই, তবে আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। অনুমিত মতলব, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং প্রমাণ করে দেখানো– কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি ব্যর্থ। পারেনি তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। সুতরাং এদেরকে আর রাষ্ট্রক্ষমতায় রাখা যাবে না, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। লাগাও আন্দোলন। শুরু করো জ্বালাও-পোড়াও আগের মতো। ক্ষমতায় আনো ওদেরকে, যারা নিজেরাই লেখাপড়া করেনি। তাহলেই হবে পোয়াবারো। প্রশ্ন ফাঁসের প্রশ্নই আর উঠবে না। মেধাবী তরুণদের লেখাপড়া করানোরই দরকার হবে না। তারা জাহাজে মহাআনন্দে ভ্রমণ করবে, হাতে থাকবে তরতাজা লাল-মরিচ, স্মার্টবয় হয়ে করবে দাদাগিরি। পকেটে চলে যাবে অর্থকড়ি অজানা জায়গা থেকে। কাজকর্ম করারই প্রয়োজন হবে না। হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন করবেন– এমনটা হলে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো চলবে কীভাবে? শিক্ষিত-দক্ষ কর্মী কোথায় পাওয়া যাবে? চিন্তা নেই। শিক্ষিত কর্মী আসবে অন্য দেশ থেকে। পণ্যের বাজারের মতো চাকরির বাজারটিও দখল করবে ভিন্‌দেশিরা। ইতিমধ্যে সুশিক্ষিত, দক্ষ লাখো ভিন্‌দেশি চাকরির বাজারে গদিনশিন হয়েছে।

অতি সম্প্রতি প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভুলে ভরা প্রশ্নপত্র। একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা লিখেছে : "চলমান প্রাথমিক সমাপনীর (পিইসি) 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি' পরীক্ষায় এক প্রশ্নপত্রে অর্ধশতাধিক ভুল ধরা পড়েছে।" সিলেট বোর্ডের ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে ৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে ৪০টিতেই ভাষা ও ব্যাকরণগত ভুল। বুঝলাম, প্রশ্নে যারা ভুল করে তারা অবশ্যই প্রশ্ন-প্রণেতা শিক্ষক। ভুল করেন, কারণ হয়তো তারা নিজেরাই ফাঁস করা প্রশ্ন দিয়ে কিংবা অসদুপায়ে পরীক্ষা দিয়ে তথাকথিত ভালো রেজাল্ট করে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষকতার চাকরিটি বাগিয়েছেন; কিন্তু সর্বদাই শিক্ষাহীন। কিন্তু যারা প্রশ্ন ফাঁস করে তারা কারা? তারা কি শুধুই শিক্ষক? প্রশ্নপত্র কম্পোজ থেকে শুরু করে মুদ্রণ ও বিতরণ পর্যন্ত বেশ দীর্ঘ চেইনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারী, নাকি অন্য কেউ? কোনো গভীর অনুসন্ধান কি হয়েছে? পারিপার্শ্বিক তথ্য-উপাত্ত কি বিশ্লেষণ করা হয়েছে? কারা এ দুর্বৃত্তায়নের কাজটি বারবার করে যাচ্ছে এবং কেন করছে, তা কি আন্তরিকতার সঙ্গে খতিয়ে দেখা হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে দেশের উদ্বিগ্ন জনগণ জানতে পারছে না কেন? আর যদি না হয়ে থাকে; কেন হচ্ছে না? কাজটি কার করার কথা? যাদের করার কথা তারা ভালো করেই জানেন– কাজটি তারা যথাসময়ে করেননি, এখনও করছেন না।

এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন পরিবেশে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা যে ভীতিজনক কিছু নয়– তা শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব, স্কুলেও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। অথচ পরীক্ষা শিক্ষার্থীবান্ধব হচ্ছে না। ভীতিকর পরিবেশে পরীক্ষা নেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করতে চাইবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরীক্ষা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এসব কীভাবে করা যাবে তা খতিয়ে দেখতে শিক্ষাক্ষেত্রের বোদ্ধাদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যায়। তৃতীয়ত, অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে আইটি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখন এ ধরনের বিশেষজ্ঞের অভাব আছে বলে আমার মনে হয় না। বিগত কয়েক বছরে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিশনের আলোকে গৃহীত সুশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের ফলে বিপুল সংখ্যক আইটি বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছে। আমার জানা কয়েকজন আইটি বিশেষজ্ঞ অনলাইন পরীক্ষা প্রকল্প হাতে নেওয়া হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও অনলাইনে পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে বিধায় আমি মনে করি, এ বিষয়ে রাজনৈতিক সাপোর্ট পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে প্রশ্ন ফাঁস রোধের লক্ষ্যে পরিকল্পিত উপায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অভিভাবকদেরও বুঝতে হবে, নিজের সন্তানদের ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিলে নিজের পায়েই কুড়াল মারা হবে। এতে শুধু দেশেরই ক্ষতি হবে না; বিদ্যাহীন 'শিক্ষিত' সন্তানদের অকর্মণ্যতা পরিবারকেও ধ্বংসের মুখে টেনে-নিয়ে যাবে। এরা সম্পদ হবে না। হবে শতভাগ দায় পরিবার ও দেশ উভয়ের জন্য।

২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিক্ষার মান উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন ঢংয়ের কোচিং বাণিজ্য আর প্রশ্ন ফাঁসের কালচার জিইয়ে রেখে মান উন্নয়নের কথা বলা বা চিন্তা করা হিপোক্র্যাসির শামিল। পলিসি প্রণেতা আর শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ধরে আছেন যারা তাদের সবাইকে বিনয়ের সঙ্গে বলি, চোখ বন্ধ করে চলার সুযোগ নেই। বন্ধ চোখে হাঁটলে হোঁচট খেতেই হবে। তখন শুধু আপনাদের পা-ই ভাঙবে না, দেশের পা-ও ভেঙে যাবে আপনাদের কারণে। অবশ হয়ে যাবে জাতির মেরুদণ্ড। সময় থাকতে ব্যবস্থা নিন। কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা সঠিকভাবে উদ্ভাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে শিক্ষাজগতের নিবেদিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের সাহায্য নিন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আশু ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচান।